সভ্যতার সঙ্কট ও প্রগতির পথ

আবুল কাসেম ফজলুল হক*

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন নামে রেনেসাঁসের স্পিরিট অবলম্বন করে স্বতন্ত্রভাবে সভ্যতার ধারা ধরে এগিয়ে চলছিল। এর মধ্যে উনিশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলো আত্মপ্রসারের জন্য জাতীয়তাবাদের নামে সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতি নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়। সংঘটিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তখন ইউরোপের দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের অনেকে এই ঘটনাবলিকে রেনেসাঁসের অবসান ও সভ্যতার সঙ্কট বলে অভিহিত করেন। সঙ্কটের অবসান ও নতুন সভ্যতা সৃষ্টির জন্য তাঁরা আধুনিক যুগের অন্যায় ও অনাচার দূর করার জন্য নতুন রেনেসাঁস সৃষ্টির প্রয়োজন ব্যাখ্যা করেন।

এর পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্যে দেখা দেয় আধুনিকতাবাদ। আধুনিকতাবাদের মর্মে ছিল চরম নৈরাশ্যবাদ ও কলাকৈবল্যবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সঙ্কট আরো ঘনীভূত হয়। সে সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে দেখা দেয় উত্তরাধুনিকতাবাদ। উত্তরাধুনিকতাবাদের মর্মে আছে শূন্যবাদ। নৈরাশ্যবাদ ও শূন্যবাদ রেনেসাঁস-বিরোধী। আসলে আধুনিকতাবাদ ও উত্তরাধুনিকতাবাদ কোনো ঘোষণা না দিয়ে সামনে আসে কাউন্টার-রেনেসাঁস রূপে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল মার্কসবাদ। মার্কসবাদ নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রত্যয় ঘোষণা করে সৃষ্টি করেছিল নতুন আশাবাদ। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপের পর সে আশাবাদ আর টেকেনি। কমিউনিস্ট পার্টির ইশতিহার প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সালে আর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপ ঘটে ১৯৯১ সালে।

এর মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ও জীবপ্রযুক্তির বিপ্লব এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপের পর বিশ্বব্যবস্থাকে যে ধারায় বিকশিত করা হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে বিশ্বায়ন। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, ন্যাটো, জি-সেভেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, জাতিসংঘ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করে চলেছে বিশ্বায়ন কর্তৃপক্ষ রূপে। বিশ্বায়নকে বলা যায় সাম্রাজ্যবাদের উচ্চতর স্তর। এই সময়ে বসনিয়া, হারজেগোবিনা, সার্বিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়ায় চলছে আগ্রাসী যুদ্ধ। প্রতি বছর লক্ষ লোকের প্রাণ যাচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়ায় আত্মপ্রকাশ করছে তালেবান, আলকায়দা, আই এস ইত্যাদি। উৎপাদন ও সম্পদ বাড়ছে, বৈষম্য আগের তুলনায় দ্রুততর গতিতে বাড়ছে, মানুষ অমানবিকৃত হয়ে চলছে। ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) থেকে রুশ বিপ্লবের বিলোপ (১৯৯১) পর্যন্ত মানবজাতি ছিল পরিবর্তন উন্মুখ।

এ-লেখায় দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যে সভ্যতার সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশের পর আজো মানবজাতি সেই সঙ্কটের মধ্য দিয়েই চলছে। এর মধ্যে সঙ্কট কাটাবার প্রচেষ্টা বার বার মার খেয়ে গেছে। এ প্রবন্ধে সভ্যতার সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভের জন্য নতুন রেনেসাঁস সৃষ্টির যৌক্তিকতা প্রমাণ করা হয়েছে। সকল জাতির রাষ্ট্রব্যবস্থাকে

*সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এবং গোটা বিশ্বব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত ও নবায়িত করার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চলমান বিশ্বায়নের জায়গায় সর্বজনীন কল্যাণের লক্ষ্যে বিশ্বসরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। বিশ্বসরকার গঠিত হলেও জাতি, জাতিরাষ্ট্র, জাতীয় সরকার, জাতীয় ভাষা, জাতীয় সংস্কৃতি থাকবে। বিশ্বসরকারের কাছে একটি সেনাবাহিনী রেখে সকল রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করতে হবে। এতে রেনেসাঁস, সভ্যতা, জাতীয় সংস্কৃতি, প্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে।

১

চৌদ্দ শতকে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে ফিউডাল লর্ড ও ভূমিদাস-চালিত কৃষি ও কুটিরশিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতি, অভিজাততান্ত্রিক বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র, আর খ্রিস্টধর্ম ও গির্জাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি নিয়ে গঠিত নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ববাদী সমাজব্যবস্থার অবক্ষয়পর্বে উদ্ভব ঘটেছিল রেনেসাঁসের। গির্জার ভেতরেই প্রথম জীবনজগত সম্পর্কে নতুন অনুসন্ধিৎসা ও নতুন চিন্তা দেখা দেয়, এবং ইনকুইজিশনের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করে তা ক্ষুদ্র শিক্ষিত সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়। রেনেসাঁস বলতে বোঝায় নবজন্ম – সভ্যতা-সংস্কৃতির নবজন্ম।

রেনেসাঁসের মর্মে ছিল সত্য ও ন্যায়ের সন্ধানে অদম্য স্পৃহা এবং মিথ্যা, অন্যায় ও দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা। রেনেসাঁসের মধ্যেই মানুষ শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তি অবলম্বন করে এবং পরকালের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ইহকালের দিকে ভালো করে তাকায়, এবং ঈশ্বরকেন্দ্রিক গির্জাকেন্দ্রিক বাইবেলকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির স্থলে মানুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে। ক্রমে মানবজাতির মধ্যে উপলব্ধি জাগে যে, মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনা ক্রমবর্ধমান ও অন্তহীন। তাতে মানুষের চিন্তা ও কর্মের প্রকৃতি বদলে যায়। মানুষ আত্মশক্তিতে আস্থাশীল ও আত্মনির্ভর হতে থাকে এবং ঈশ্বর ও ধর্মগ্রন্থের উপর নির্ভরশীলতা ত্যাগ করতে থাকে।

রেনেসাঁস হল মধ্যযুগের গর্ভ থেকে আধুনিক যুগকে মুক্ত করার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে জীবনবাদী নতুন নতুন সৃষ্টি ও আবিষ্কার-উদ্ভাবন দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থাকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর করার আন্দোলন। রেনেসাঁস হল এক দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক আন্দোলন যা দ্বারা মানুষের জীবনজগতদৃষ্টিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে চলে এবং সর্বক্ষেত্রে আঁকা-বাঁকা উঁচু-নিচু পথ ধরে সৃষ্টি ও প্রগতির ধারা বহমান থাকে।

রেনেসাঁসে ভালোর সঙ্গে মন্দও ছিল – ভালো-মন্দ মিলিয়েই মানুষ ও তার সমাজ। মন্দবিহীন শুধুই ভালো কিছুই পাওয়া যায় না। রেনেসাঁসের ভাবপ্রবাহের বিকাশের মধ্যেই পর্যায়ক্রমে দেখা দেয় উপনিবেশবাদ, ক্রুসড ও সাম্রাজ্যবাদ। খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মধ্যেও গিয়েছে বিরোধ। উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামও চলে। মানুষের সমাজে ভালো মন্দকে পরাজিত রাখবে এবং প্রগতির বাধা দূর করে করে এগিয়ে চলবে – এটাই ছিল কাম্য। রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে বিকশিত শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদের লক্ষ্য ছিল পৃথিবীকেই স্বর্গে উন্নীত করা। রেনেসাঁস ছিল পশ্চিম-ইউরোপকেন্দ্রিক। ক্রমে তা ইউরোপের ও অন্যান্য মহাদেশের সকল জাতির মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলা ভাষার দেশে উনিশ শতকের প্রথম পাদে রামমোহনের (১৭৭২-১৮৩৩) চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছিল রেনেসাঁস। একাত্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত কালে আমাদের এখানেও জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতে বহমান ছিল রেনেসাঁসের স্পিরিট। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে সার্বিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে সে ধারা ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ে। তবে লেখকের চেতনায় রেনেসাঁসের স্পিরিট বহমান আছে।

২

উঁচু-নিচু, আঁকা-বাঁকা পথ ধরে চৌদ্দ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত ইউরোপে রেনেসাঁসের স্পিরিট কার্যকর ছিল। উনিশ শতকের শেষে ইউরোপ-আমেরিকার বৃহৎ শক্তিবর্গ যখন কর্তৃত্ব বিস্তারের ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায়

মত্ত হয়ে সংঘাতের দিকে এগিয়ে চলে, তখন তাতে দেখা দেয় ভাটা এবং তা দ্রুত ক্ষয় পেয়ে যেতে থাকে। ওই সময়েই সংঘটিত হয় দুই বিশ্বযুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক নানা ঘটনা। যুদ্ধের ও আনুষঙ্গিক ঘটনাবলির অভিঘাতে মানুষের জীবনোপলব্ধি ও চিন্তা-চেতনা বদলে যেতে থাকে। সে-অবস্থায় কাউন্টার-রেনেসাঁস রূপে প্রথমে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রচারিত হয় আধুনিকতাবাদ (modernism), ও পরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় প্রচারিত হয় উত্তরাধুনিকতাবাদ (postmodernism)। আধুনিকতাবাদ ও উত্তরাধুনিকতাবাদকে বুঝতে হবে এসব নিয়ে আন্দোলনকারীদের দেওয়া অর্থ দিয়ে। শব্দগত অর্থ আর মতবাদগত অর্থ এক নয়। আধুনিকতাবাদীরা ও উত্তরাধুনিকতাবাদীরা রেনেসাঁসের বিরুদ্ধে কোনো ঘোষণা না দিয়ে কাজ করে চলেন রেনেসাঁসকে শেষ করে দেওয়ার জন্য। আধুনিকতাবাদের মর্মে ছিল নৈরাশ্যবাদ (pessimism) ও কলাকৈবল্যবাদ (art for art's sake); আর উত্তরাধুনিকতাবাদ নেতিবাদী (negativist) ও শূন্যবাদী (nihilist)।

মানবজাতির উন্নত ভবিষ্যত সৃষ্টি নিয়ে আশাভঙ্গের প্রত্যক্ষ কারণ হয়েছে দুই বিশ্বযুদ্ধ। আর নৈরাশ্যবাদী ও শূন্যবাদী চিন্তার উদ্ভবের কারণ হয়েছে উন্নত ভবিষ্যত নিয়ে আশাভঙ্গ – হতাশা। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস কমে গেছে, বেড়ে গেছে সামাজিক বিযুক্তি (alienation)। রেনেসাঁসে নানা প্রবণতা ছিল বটে, তবে দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে সৃষ্টিশীলতা ও গণমুখী প্রবণতা ছিল মূল। আধুনিকতাবাদ ও উত্তরাধুনিকতাবাদ গণবিমুখ, প্রগতির পরিপন্থী; তবে শিল্পের জন্য শিল্প চর্চায় ও জ্ঞানের জন্য জ্ঞান চর্চায় তাদের উৎসাহ কম নয়। সেক্ষেত্রে কেউ কেউ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন; গভীর দুঃখবোধের ও নিরঙ্কুশ নেতিবাদী চেতনার সুন্দর শিল্পিত প্রকাশ আছে কারো কারো কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, চিত্রকলায়; কিন্তু সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা গঠনমূলক প্রবণতা নেই।

দেশান্তর যাত্রা, দুঃসাহসী অভিযান – আমেরিকা, উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু আবিষ্কার, অস্ট্রেলিয়ার ও অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকার রহস্য সন্ধান, এভারেস্ট বিজয়, মহাকাশ অভিযান ইত্যাদির মর্মেও ছিল রেনেসাঁসেরই স্পিরিট।

মানববাদ, উপযোগবাদ, ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে রেনেসাঁসের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে। রেনেসাঁসের ধারা ধরেই উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ও বিভিন্ন ধারার প্রযুক্তি। ইহলৌকিক উপলব্ধিজাত মানববাদী শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির মর্মেও কাজ করেছে সজ্ঞান অথবা অজ্ঞান রেনেসাঁসের স্পিরিট।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশালতার এবং আধুনিকতাবাদ ও উত্তরাধুনিকতাবাদের উদ্ভব ও বিকাশের পেছনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির *অপব্যবহারের* বিশেষ ভূমিকা আছে। বৃহৎ শক্তিবর্গের উপনিবেশ বিস্তারের পেছনেও সহায়ক হয়েছিল তাদের উন্নত প্রযুক্তি। *বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের যেমন অন্তহীন সুফল আছে, তেমনি এসবের অপব্যবহারের আছে অন্তহীন কুফল।* সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার নির্ভর করে তাদের উপর, যারা এগুলোর উপর কর্তৃত্ব করে। আবিষ্কারক-উদ্ভাবকেরা, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকেরা এগুলোর উপর কর্তৃত্ব রক্ষা করতে পারেন না, কর্তৃত্ব দখল করে নেয় হীন-স্বার্থান্বেষীরা ও কায়েমি-স্বার্থবাদীরা। এই জায়গায় দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকেরা অসহায়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির *অপব্যবহার* অনেক জাতিকে পরাধীন করেছে, দুনিয়াব্যাপী সামাজিক অবিচার বাড়িয়েছে, যুদ্ধ-বিগ্রহকে ভয়াবহ রূপ দিয়েছে, এবং অনেকের মধ্যে রুগ্ন চেতনার (morbidity) ও হতাশার জন্ম দিয়েছে।

প্রযুক্তি সাধারণত বৈষয়িক সম্পদ বৃদ্ধির অবলম্বন হয়; কিন্তু বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও বৈষয়িক সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের মন-মানসিকতা ও নৈতিক চেতনা উন্নত হয় না, মানবিক গুণাবলি বৃদ্ধি পায় না। ফলে সঙ্কট দেখা দেয়। রেনেসাঁসের সাধকেরা এ সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন, কিন্তু পারেননি। আধুনিক যুগের মহান অগ্রগতির মধ্যে অনেক অনাচার ও দুরাচারও আছে। এসব নিয়ে মুক্তির লক্ষ্যে গুরুতর চিন্তা দরকার। মুক্তি মানে সমস্যা থেকে মুক্তি – সমস্যার সমাধান।

৩

রেনেসাঁসের বিকাশের এক পর্যায়ে, আঠারো শতকের মধ্যপর্বে, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে সূচিত হয় শিল্পবিপ্লব। শিল্পবিপ্লবও বিকাশশীল। বন্ধুর পথপরিক্রমার মধ্য দিয়ে এর ধারা বহমান আছে। আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বৃহদায়তন শিল্প-কারখানা রেনেসাঁসেরই প্রসূন।

এরই মধ্যে সংঘটিত হতে থাকে রাষ্ট্রবিপ্লব। সবচেয়ে প্রভাবশালী রাষ্ট্রবিপ্লব হল ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯), রুশ বিপ্লব (১৯১৭) ও চিনবিপ্লব (১৯৪৯)। রাষ্ট্রবিপ্লবের পেছনেও জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। রাষ্ট্রবিপ্লবও রেনেসাঁসেরই অভিব্যক্তি। যে কোনো মতাদর্শের (creed) উদ্ভব ও বিকাশের পেছনেও কাজ করে জীবনধারার উপর নতুন প্রযুক্তির প্রভাব। আজকের পৃথিবীতে নতুন মতাদর্শের উদ্ভবের বাস্তবতা বিরাজ করছে।

সভ্যতার যেমন বৈষয়িক দিক আছে, তেমনি আছে মানসিক ও চিন্তাগত দিকও। উৎপাদন ও বণ্টন, আইন-কানুন ও শাসনব্যবস্থা এবং উন্নত ভবিষ্যতের আশা ও আদর্শ হয়ে থাকে সভ্যতার অবলম্বন। এগুলোতে ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় আছে। সভ্যতা হল সমাজে মন্দের সঙ্গে ভালোর সংগ্রাম, সেই সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা, সুসম্পর্ক, সৃষ্টিশীলতা ও সম্প্রীতির মনোভাব। সভ্যতার মর্মে ক্রিয়াশীল থাকে নৈতিক চেতনা – ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে ধারণা আর বাস্তব-জীবনে তার অনুশীলন। প্রতিটি সভ্যতার আছে সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি।

ইতিহাসে দেখা যায়, বিজ্ঞানের বড় রকমের অগ্রগতি ও প্রযুক্তির বড় রকমের বিস্তার ঘটলে সভ্যতা সঙ্কটে পড়ে। সঙ্কটের কারণ – প্রচলিত মূল্যবোধ, আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে নতুন অবস্থার মধ্যে চলা যায় না। নতুন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভিঘাতে কখনো কখনো চলমান সভ্যতা ভেঙে পড়ে, এবং নতুন সভ্যতা সৃষ্টির তাগিদ দেখা দেয়। প্রভাবশালী নতুন প্রযুক্তি যখন ব্যাপকভাবে মানুষের ব্যবহারে আসে, তখন তার অভিঘাতে মানুষের জীবনযাত্রাপ্রণালি ও সামাজিক সম্পর্ক লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। তাতে মানুষের মূল্যবোধ ও সংস্কার-বিশ্বাস বদলে যেতে থাকে। প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, আইন-কানুন, রাষ্ট্রব্যবস্থা – সব কিছুতেই পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

প্রযুক্তি সব সময়ই মানুষকে শ্রমের দায় থেকে কম-বেশি মুক্তি দেয়, মানুষের আরাম-আয়েসের সুযোগ বাড়ায়, নতুন নতুন বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের অবলম্বন হয়। বাস্তবে দেখা যায়, কয়েমি-স্বার্থবাদীরা ও হীন-স্বার্থান্বেষীরা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শিল্প-কারখানা, উৎপাদনব্যবস্থা ও সম্পদের মালিকানা কিনে নেয়। সর্বজনীন কল্যাণের বিবেচনাকে যথোচিত গুরুত্ব না দিয়ে তারা সব কিছুকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে। সাধারণ মানুষ নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় পিছিয়ে থাকে। তারা নিজেদের নেতৃত্ব তৈরি করতে ও ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়। ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা শক্তিশালী হয়, অনৈক্যে দুর্বল থাকে। স্বল্পসংখ্যক প্রবল সবকিছু দখল করে নেয়, এবং তাদের দ্বারা বিপুলসংখ্যক দুর্বল শোষিত ও নির্যাতিত হয়; সমাজে বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কে শিথিলতা (alienation / estrangement) দেখা দেয়, বিরোধ বাড়ে; সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ও সংহতি নষ্ট হয়।

সমস্যার এক দিকে আছে প্রবল, অপরদিকে আছে দুর্বল – কখনো কখনো দেখা যায়, একদিকে জালেম, অপরদিকে মজলুম।

সব সমাজেই ন্যায়-অন্যায় ও উচিত-অনুচিত সম্পর্কে কিছু ধারণা প্রচলিত থাকে। প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, আইন-কানুন সেসব ধারণার সঙ্গে কম-বেশি সঙ্গতি রেখে প্রতিষ্ঠিত থাকে। বড় আকারে নতুন প্রযুক্তি যখন সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানুষের জীবনযাত্রাপ্রণালিতে প্রবেশ করে, তখন প্রয়োজন দেখা দেয় আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের ও নবায়নের। এই পুনর্গঠন ও নবায়ন সর্বজনীন কল্যাণে করা হলে সভ্যতা বিকাশশীল থাকে, আর কেবল কায়েমি-স্বার্থবাদীদের স্বার্থে করা হলে সভ্যতা বিকারপ্রাপ্ত ও সঙ্কটাপন্ন হয়, আইনের শাসন বজায় থাকে না, এবং সমাজে, রাষ্ট্রে আমূল পরিবর্তনের বাস্তবতা তৈরি হয়।

শিল্পবিপ্লবের ধারায় প্রযুক্তি ও শিল্প-কারখানার বিকাশ এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর কায়েমি-স্বার্থবাদীদের মালিকানা ও কর্তত্ব দেখে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সক্রিয় সৃষ্টিশীল ব্যক্তিরা উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হন। *ইতিহাসে দেখা যায়, সঙ্কটকালে দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকেরা মন-মানসিকতা এবং সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ও প্রগতি সাধনের মাধ্যমে সঙ্কটের সমাধান খুঁজেছেন, আর শিল্পী-সাহিত্যিকেরা মানুষের ভবিষ্যত নিয়ে হতাশ হয়েছেন এবং পলায়নবাদী কিংবা নৈরাশ্যবাদী অবস্থান নিয়েছেন।* অবশ্য দুই ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমও থাকে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের চিন্তার ও অনুভূতির, দর্শন-বিজ্ঞানের ও শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে এ ব্যাপারটি লক্ষ করা যায়। বিশ্বযুদ্ধ পর্বে আধুনিকতাবাদ ও উত্তরাধুনিকতাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ ওইসব দেশেই ঘটেছে, এবং সেখান থেকে এগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সব দেশে, সব জাতির মধ্যে।

গত কয়েকশো বছর ধরে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে মানবজাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে গ্রেকো-রোমান-ইউরো-আমেরিকান সভ্যতা। সেজন্য আমরা ওই সভ্যতার ধারা ধরে চিন্তা করছি। তবে আমরা মনে করি, প্রত্যেক জাতির কর্তব্য নিজের স্বার্থ বিবেচনা করে জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ অবলম্বন করে চিন্তা ও কাজ করা। জাতীয় স্বার্থ বিবেচনার সময় জাতির অন্তর্গত সব মানুষের স্বার্থ বিবেচনা করা উচিত। সর্বজনীন কল্যাণ আর প্রবলদের স্বার্থ – দুটোর মধ্যে বিরোধ আছে।

শোষণ-পীড়ন-প্রতারণার, অন্যায়-অবিচারের, সহিংসতার, উপনিবেশবাদ-সাম্রাজ্যবাদের, যুদ্ধ-বিগ্রহের ও রাষ্ট্রবিপ্লবের পটভূমিতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে সৃষ্ট সমস্যা চিন্তাশীল ভাবুক ও কর্মীদের এবং রাজনীতিবিদদের যতটা মনোযোগ দাবি করে, ততটা মনোযোগ পায়নি। দুই বিশ্বযুদ্ধের পর্বে প্রশ্ন উঠেছিল : 'বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ?' 'মানুষের কি কোনো ভবিষ্যত আছে?' 'মানুষ কি বর্বরতায় ফিরে যাচ্ছে?' নানাভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা হয়েছে। মানবজাতির নৈতিক উন্নতির অপরিহার্যতার কথা বলা হয়েছে। চেষ্টা করতে হবে – চেষ্টা করলে ফসল হওয়া যাবে, হাল ছেড়ে দিলে হবে না।

৪

ইউরোপে সভ্যতার উপর শিল্পবিপ্লবের অভিঘাতের মধ্যে উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে উদ্ভব ঘটে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ও মার্কসবাদের। কমিউনিস্ট পার্টির ইশতিহার প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সালে। সকল জাতির চিন্তাশীলদের বিরাট অংশ মার্কসবাদ, রুশবিপ্লব (১৯১৭) ও চিনবিপ্লবের (১৯৪৯) ধারা ধরে সঙ্কটের সমাধান ও মানবজাতির প্রগতিশীল ভবিষ্যত আশা করে চলছিলেন। তাঁরা আশা করতেন, অনুশীলনের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা হবে। কিন্তু রুশ বিপ্লবের পর পৌনে এক শতাব্দী পার হতে না হতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে (১৯৯১), চিন পর্যায়ক্রমে মার্কসবাদ ও মাও সেতুঙের চিন্তাধারা থেকে সরে যাচ্ছে। *শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্বের দ্বারা মানবজাতির মুক্তি ও প্রগতির মতবাদ এখন আর আবেদন সৃষ্টি করে না।*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) আরম্ভ হওয়ার অন্তত দুই দশক আগে থেকে – ইউরোপ-আমেরিকায় রেনেসাঁসের ধারা ক্ষীণ হয়ে পড়ার ও শিল্প-সাহিত্যে আধুনিকতাবাদের উদ্ভবের সময় থেকে – মানবজাতি গভীর সভ্যতার সঙ্কটে নিপতিত আছে। মার্কসবাদকে খুব সম্ভাবনাময় মনে করা হয়েছিল। কিন্তু মার্কসবাদের নানা অবদান সত্ত্বেও মার্কসবাদ দ্বারা সঙ্কট কাটেনি। ১৯৮০-র দশক থেকে তথ্যপ্রযুক্তি ও জীবপ্রযুক্তির বিপ্লব ও বিস্তার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয় সঙ্কটকে গভীরতর করেছে। জাতিসঙ্ঘ, বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, জি সেভেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও ন্যাটোর কর্তৃত্বে ও পরিচালনায় নিরঙ্কুশ পুঁজিবাদ ও অবাধ-প্রতিযোগিতাবাদ অবলম্বন করে বিশ্বায়নের নামে যে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে তাতে সভ্যতার সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে, দুনিয়াব্যাপী সাধারণ মানুষ – জনগণ – এখন সম্পূর্ণ মনোবলহারা (demoralized)। কার্যত জাতিসঙ্ঘ পরিণত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের সঙ্গে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের পরেই যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি দার্শনিক ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা *The End History* গ্রন্থের মাধ্যমে, স্যামুয়েল পি হান্টিংটন *The Clash of Civilizations* গ্রন্থের মাধ্যমে এবং ড. ইউনূস social business

ও আদর্শ NGO এবং আদর্শ civil society organization প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবজাতিকে এগিয়ে চলার যে পথ প্রদর্শন করেছেন, তা দ্বারা সভ্যতার সঙ্কট কাটছে না। এঁদের প্রদর্শিত পথ ধরেই যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়াকে চালাচ্ছে – অন্যায়-অবিচার ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়ে চলছে।

৫

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই স্পেংলার (Oswald Spengler 1880–1936), সুইটজার (Albert Schweitzer 1875–?) প্রমুখ দার্শনিক মত প্রকাশ করে আসছেন যে, তেরো-চৌদ্দ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপ থেকে যে রেনেসাঁস বিকশিত হয়ে চলছিল, উনিশ শতক শেষ হতে না হতেই ইউরোপে তা ক্ষয় পেয়ে গেছে এবং তার ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হতে আরম্ভ করেছে বিশ্বযুদ্ধ। এই ঘটনাকে তাঁরা সভ্যতার সঙ্কট, ইউরোপীয় সভ্যতার অবক্ষয় (decay) ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন। *সঙ্কট কাটাবার জন্য তাঁরা আগেরকার রেনেসাঁসের সমালোচনার মধ্যদিয়ে, অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, নতুন রেনেসাঁস সৃষ্টির প্রয়োজনের কথা বলেছেন।* তাঁরা জোর দিয়েছেন নতুন রেনেসাঁস সৃষ্টিতে। নতুন রেনেসাঁসের বিকল্প তাঁরা ভাবতে পারেননি। যত সময় যাচ্ছে, ততই তাঁদের বক্তব্যের সঠিকতা প্রকটিত হচ্ছে। কিন্তু তাঁদের চিন্তা উত্তরকালের জ্ঞানীদের, রাজনীতিবিদদের ও আন্দোলনকারীদের (activists) মনোযোগ কমই পেয়েছে। আধুনিকতাবাদ ও উত্তরাধুনিকতাবাদ নিয়ে সভ্যতার সঙ্কট বাড়ছে। চমস্কি, স্টিগলিজ প্রমুখ দার্শনিক চলমান বিশ্বায়নের কঠোর সমালোচক। সমালোচনার মধ্য দিয়ে দরকার নতুন রেনেসাঁস সৃষ্টিতে এগিয়ে চলা। চমস্কি বাকুনিনের অনুসারী, তাঁর সমাজদর্শন ইউটোপিয়ান।

আগেকার রেনেসাঁসের লক্ষ্য ছিল মধ্যযুগের সংস্কার-বিশ্বাস, ভ্রান্তি ও অনাচার অতিক্রম করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য অবলম্বন করে সভ্যতার ধারায় প্রগতির পথ ধরে এগিয়ে চলা ও উন্নততর নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টি করা। এখন নতুন রেনেসাঁসের লক্ষ্য হবে আধুনিক যুগের সংস্কার-বিশ্বাস, ভ্রান্তি ও অনাচার অতিক্রম করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য অবলম্বন করে প্রগতির পথ ধরে নতুন সভ্যতার ধারায় এগিয়ে চলা। এই অগ্রযাত্রার অভাবে মধ্যযুগের পরাজিত সংস্কার-বিশ্বাস ও ভাবধারা পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে – মনে হয় যেন ইতিহাসের চাকা পেছন দিকে ঘুরছে। প্রত্যেক জাতির মধ্যে বিবেকবান চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরই বিবেচনার কেন্দ্রীয় বিষয় আজ হওয়া উচিত এটা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানবজাতির মহান সৃষ্টি। এই সৃষ্টির ধারাকে রক্ষা করতে হবে, এবং এর বিকাশের সুযোগ অবারিত রাখতে হবে। মানুষের মনোজগতের প্রতি বিজ্ঞানকে অনেক বেশি প্রসারিত করতে হবে – মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বজনীন কল্যাণের লক্ষ্যে বিকশিত করতে হবে। পশ্চাৎবর্তী দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে অগ্রবর্তী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গ্রহণ করে শক্তিশালী হতে হবে। শক্তিশালী হওয়ার উপায় তাদের বের করতে হবে। *দুর্বল থাকলে শোষণ-বঞ্চনা ভোগ করতেই হয়। দুর্বল থাকা অন্যায়। প্রকৃতির ন্যায় মাৎস্যন্যায়। বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে খায়। বাঘ, সিংহ হরিণকে মেরে খায়। মানুষের সমাজে প্রবল দুর্বলের উপর শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা চালায়।* আসলে ন্যায়-অন্যায় সম্পূর্ণ মানবীয় ব্যাপার। মানুষকে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং অন্যায়কে প্রতিরোধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা চালাতে হয়। দুর্বলেরা শক্তিশালী হয় ঐক্যবদ্ধ হয়ে। দুর্বল থাকলে শোষণ-পীড়ন প্রতারণা ভোগ করতেই হয়। শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্য এবং সৃষ্টি ও প্রগতির জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালাতে হয়। এই চেষ্টা কমে গেলে শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা ও পীড়ন বেড়ে যায়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য সর্বজনীন কল্যাণের বিজ্ঞানসম্মত রাজনীতি গড়ে তুলতে হবে, এবং মহান রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে। নতুন রেনেসাঁস দেখা দিলে এসব বিষয় কেন্দ্রীয় বিবেচনা পাবে।

৬

স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধি, শ্রীঅরবিন্দ এবং বিভিন্ন জাতির আরো অনেক মনীষী মানুষের মধ্যকার নৈতিক চেতনার যে জাগরণ ও যে নতুন মানবসমাজ গড়ে তোলার কথা ভেবেছেন, পরিপূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে সেই চিন্তাকে

বাস্তবসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিতে হবে এবং রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে নৈতিক বিবেচনাকে কার্যকর করে চলতে হবে। নৈতিক চিন্তাকে হতে হবে বিজ্ঞানভিত্তিক, বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবানুগ। ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন জাতির মহান সব চিন্তাধারার সঙ্গে এশিয়ার বিভিন্ন জাতির মহান সব চিন্তাধারার সংশ্লেষণ (synthesis) ঘটাতে হবে। সভ্যতার বিকাশে ধর্মের ভূমিকাকে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিরও নবায়ন দরকার। আর্থিক উন্নতির কর্মসূচির সঙ্গে নৈতিক উন্নতির বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচি অবলম্বন করতে হবে।

বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র এখন তার *সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনে* গান্ধির অহিংসা বিষয়ক কিছু উক্তি প্রচার করছে। কিন্তু সে চলছে তার সহিংস নীতি নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবাজ। স্বার্থ সন্ধানে তার আচরণ ভয়ঙ্কর।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের চিন্তাকে বিকশিত করে, বাস্তবসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিয়ে গোটা মানবজাতির কল্যাণে কায়েমি স্বার্থবাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে হবে। *নৈতিক বিবেচনাকে সব সময় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক বিবেচনার মর্মে স্থান দিতে হবে*। শোষণ-পীড়ন-প্রতারণা থেকে মুক্তির ও উন্নতির এটাই উপায়।

মানবপ্রকৃতি এমন যে, কোনো জনসমষ্টি নৈতিক দিক দিয়ে একবার জয়ী হলে তা চিরকালের বিজয় হয় না; মানুষের সমাজে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম ক্রমাগত চালিয়ে যেতে হয়। ন্যায়ের কথা বলে যে ধারা জয়ী হয়, অচিরেই সেই ধারা অন্যায়কারী হয়ে উঠতে থাকে। মানবপ্রকৃতি জটিল ও রহস্যময়। সম্মিলিত জীবনধারায় সজ্ঘশক্তি অবলম্বন করে মানবপ্রকৃতিকে উন্নত করার উপায় বের করতে হবে। কোনো নৈতিক বিজয়কেই স্থায়ী বিজয় ভাবা যাবে না। সভ্যতার সঙ্কট কাটিয়ে প্রগতির ধারায় উত্তীর্ণ হতে হলে রাষ্ট্রীয় আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টার সঙ্গে নৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টাকে অবিচ্ছেদ্য রূপে যুক্ত রাখতে হবে। কায়েমি-স্বার্থবাদীরা কখনো এই ব্যাপারটি অনুমোদন করে না। তারা কেবল মাথাপিছু গড় আয় ও মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেয়।

৭

গ্রেকো-রোমান-ইউরো-আমেরিকান চিন্তাধারা ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মধারায় সুস্পষ্ট দুটি শাখা দৃষ্টিতে পড়ে :

এক শাখায় আছে সর্বজনীন কল্যাণচিন্তা, মহান আবিষ্কার-উদ্ভাবন, প্রগতিশীল দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প-সাহিত্য ও মতাদর্শ। এ শাখা সৃষ্টিশীল, প্রগতিশীল, মানবজাতির জন্য কল্যাণকর – সকল জাতির জন্য প্রয়োজন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রহণীয়।

অপর শাখায় আছে কায়েমি স্বার্থবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতা – উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে থেকে এই দ্বিতীয় ধারার চিন্তক ও কর্মীরা আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু পথ ধরে পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী হয়েছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সকল কেন্দ্রে কর্তৃত্ব দখল করে নিয়েছে। এই শক্তিকে বলা যায় অপশক্তি। আজকের অত্যুন্নত নতুন প্রযুক্তির দুনিয়ায় কর্তৃত্বশীল আছে এই অপশক্তি। এই অপশক্তির বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ার জনগণের ঐক্য দরকার। নতুন রেনেসাঁসের স্পিরিট এটা দাবি করে।

বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার আর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের পর যে বাস্তবতা দেখা দিয়েছে, তাতে দুনিয়াব্যাপী সাধারণ মানুষ – জনগণ – মনোবলহারা (demoralized)। বিবেকবান চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও কোণঠাঁসা – প্রচারমাধ্যম তাঁদের অনুকূলে নেই। সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে, প্রচারমাধ্যমের মালিকরা কায়েমি-স্বার্থবাদী। দুনিয়াব্যাপী প্রযুক্তির অনেক সদ্ব্যবহার হচ্ছে, অপব্যবহারও অনেক হচ্ছে। অপব্যবহারের কুফল মানবজাতি ভোগ করছে। অন্যায়-অবিচারের শক্তিকে প্রবল দেখে সর্বত্র জনগণ আজ পরিবর্তনবিমুখ – হতবুদ্ধি। যে কোনো পরিস্থিতিতে সকলেই ধরে নেন যে, অন্যায়-অবিচারের, জুলুম-জবরদস্তির, হত্যা-আত্মহত্যার কোনো প্রতিকার নেই – দুনিয়া এভাবেই চলবে। ন্যায়ের পথে চলার জন্য দল দরকার – জনগণের ভেতর থেকে, জনগণের দ্বারা, জনগণের কল্যাণে গঠিত রাজনৈতিক দল। সে কাজ কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। লোকে বলে, 'দল নাই যার বল নাই তার।' অবশ্য খারাপ দলের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আমরা ভালো উদ্দেশ্যে ভালো দল গঠনের কথা বলছি।

ফরাসিবিপ্লব থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয় (১৭৮৯-১৯৯১) পর্যন্ত দুশো বছর মানুষ ছিল পরিবর্তনউন্মুখ, এখন মানুষ পরিবর্তনবিমুখ। জনমনে তখন উন্নত ভবিষ্যতের আশা ছিল, প্রগতির উপলব্ধি ছিল। সঙ্কটের গভীর উপলব্ধি ও সঙ্কট অতিক্রম করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা – কোনোটাই মানুষের মধ্যে এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষের উপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। দুর্বল মানুষ চলছে প্রবলের জুলুম-জবরদস্তি মেনে নিয়ে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্বল মানুষ প্রবল হওয়ার চেষ্টা করছে না। নেতৃত্ব আশা করছে, কিন্তু নেতৃত্ব তৈরি করার দায়িত্ব গ্রহণে এগুচ্ছে না। বাইবেলে আছে, Man does not live by bread alone. এখন তো মানুষকে অন্য রকম দেখা যাচ্ছে। মানুষ কি কেবল খেয়ে-পরে সব রকমের জুলুম-জবরদস্তি, অন্যায়-অবিচার, মিথ্যা ও প্রতারণা সহ্য করে নীরবে জীবন যাপন করে চলবে? নতুন প্রযুক্তির পরিমণ্ডলে মানুষ কি তার আচরণ ও প্রকৃতিকে উন্নত করতে চেষ্টা করবে না?

বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস স্মরণ করে বলা যায়, অবস্থা এ রকম থাকবে না, আবার মানুষ পরিবর্তনে আগ্রহী হবে – এক সময় পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে। শোষণ-পীড়ন-প্রতারণা ও বঞ্চনা সহ্য করে কতকাল মানুষ প্রতিবাদহীন ও অসংগঠিত থাকবে? উন্নত অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। মানুষে চাইলে, চেষ্টা করলে, অবস্থা উন্নত করতে পারবে। প্রগতির সম্ভাবনা অফুরন্ত। পশ্চিমা অপশক্তি ও তার অনুসারীদের মোকাবিলা করে প্রগতিশীল ভাবধারাকে উচ্চে স্থান দিতে হবে।

৮

গত প্রায় চার দশকের মধ্যে নবআবিষ্কৃত তথ্যপ্রযুক্তি, জীবপ্রযুক্তি ও অন্যান্য প্রযুক্তির অভিঘাতে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের পরিবেশ ও মানুষ বদলে গেছে এবং পরিবর্তনের এই ধারা অব্যাহত আছে। চলমান অবস্থায় মানুষের নৈতিক চেতনা নিম্নগামী। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতি হলেও এবং অর্থসম্পদ বৃদ্ধি পেলেও মানুষের মন উন্নত হয়নি। মন উন্নত হওয়ার মতো পরিবেশ নেই। *নৈতিক উন্নতির জন্য পরিপূর্ণ সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন লাগবে।*

বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দেখে এবং ক্ষমতাবান ও শক্তিমানদের বেপরোয়া আচরণ লক্ষ করে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, মানুষের চেতনা থেকে ন্যায়-অন্যায়ের বোধ কি উবে যাচ্ছে? যারা কায়েমি স্বার্থবাদী, প্রশ্ন তাদের নিয়ে নয়; সব সময় তারা নৈতিক বিষয়কে ধামাচাপা দেয়, যারা সাধারণ মানুষ – যারা সংখ্যায় শতকরা আটানব্বই ভাগ, প্রশ্ন তাদের নিয়ে। এ সমাজের ভেতর থেকে বিবেকবান, চিন্তাশীল, সত্যসন্ধ ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করবেন না? সাধারণ মানুষ সেদিকে দৃষ্টি দেবে না?

রেনেসাঁসের সূচনা থেকে উঁচু-নিচু আঁকা-বাঁকা পথ ধরে ছয়শো বছর ব্যাপী মানবজাতির যে বিকাশ, সাধারণভাবে তা ছিল প্রগতির ধারায়। ওই সময়টাই আধুনিক সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশের কাল। আধুনিক যুগের মর্মে নানা প্রবণতার মধ্যে প্রধান ছিল রেনেসাঁসের স্পিরিট, যা এখন নিতান্ত ক্ষীণ। তবে আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে শিল্পবিপ্লবের ধারা নানা পর্যায় অতিক্রম করে আজো বহমান আছে। ক্রমাগত নতুন প্রযুক্তি সামনে আসছে। এরই ফলে বৈষয়িক সম্পদে মানবজাতি আজ এত সম্পন্ন।

এটাও উল্লেখ্য যে, *আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এবং বিভিন্ন ভূভাগের প্রান্তিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ নতুন সভ্যতা আত্মস্থ করে মানবজাতির মূল ধারায় শামিল হতে পারেনি। প্রবল জাতিগুলো তাদেরকে দাবিয়ে রাখছে। তারাও নিজেদেরকে শামুকের মতো নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে রাখতে চাইছে। বৃহৎ শক্তিগুলোর দিক থেকে তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে চিরকালের জন্য আদিবাসী করে রাখার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।* যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার রেড ইন্ডিয়ানদের ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ইতিহাস দেখলে তা বোঝা যায়। জাতিসঙ্ঘের – ইউনেস্কোর – আদিবাসী নীতি অবিলম্বে পরিবর্তন করা দরকার। *বিলীয়মান মাতৃভাষা সমূহকে রক্ষা করা যাবে না।* বিকাশশীল মাতৃভাষা সমূহের উপরেই নির্ভর করতে হবে। *আদিবাসীদের মানবজাতির মূল ধারায় আসতে দিতে হবে।* আদিবাসীদের উন্নতির জন্য তাদের চিন্তা-চেতনার উন্নতি দরকার – নিজেদেরকে নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে রাখার

মনোভাব তাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। যারা তাদেরকে চিরকালের জন্য আদিবাসী করে রাখতে চায়, তারা চায় না যে তাদের চিন্তা-চেতনা উন্নত হোক।

রেনেসাঁসের কালে দেখা গেছে, মানুষের উপলব্ধিতে বর্তমান যতই সমস্যাসঙ্কুল হোক, মানুষ আশা করেছে উন্নততর ভবিষ্যত। এর মধ্যে প্রগতির পরিপন্থী ও হীন-স্বার্থান্বেষী কার্যক্রম দ্বারা প্রগতির ধারা বাধাগ্রস্ত হলেও থেমে যায়নি – সাময়িক ক্ষয়-ক্ষতির পর বেগবান হয়েছে। প্রগতি সাধিত হয়েছে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মোকাবিলার মধ্য দিয়ে। প্রতিক্রিয়ার শক্তি কায়েমি-স্বার্থবাদী ও প্রগতিবিরোধী। নতুন প্রযুক্তি বার বার আঘাত করেছে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রাপ্রণালিকে। তাতে প্রতিক্রিয়ার শক্তি তৎপর হয়েছে। অত্যুন্নত নতুন প্রযুক্তির অভিঘাতে বাস্তবতা এখন এমন এক রূপ নিয়েছে যে, এখন আর কোনো প্রগতিশীল শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না, প্রগতিশীল বলে যারা আত্মপরিচয় দেন, তাঁরা প্রগতিশীল নন। কেবল ধর্মের বিরোধিতা করার, নৈতিক-বিবেচনা-বর্জিত কথিত মুক্তবুদ্ধিচর্চার, আর উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রচার করার মধ্যে তো প্রগতির কিছু থাকে না। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, কথিত ধর্মপন্থীরা যত আক্রান্ত হচ্ছে, ততই বাড়ছে। গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের আদর্শগত ও সাংগঠনিক দুর্বলতাই এর মূল কারণ। লোকে কথিত গণতন্ত্রীদের ও কথিত সমাজতন্ত্রীদের কর্মকাণ্ডে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা খুঁজে পায় না। লক্ষণীয় যে, ধর্মপন্থীদের কোনো কোনো অংশেও জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চর্চা আছে। মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের উত্থানের পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সজ্ঞান-সচেতন-সক্রিয় পরিকল্পিত ভূমিকা আছে।

রেনেসাঁসের কালে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতি আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। মানুষ অপরিসীম শক্তি ও অন্তহীন সম্ভাবনার অধিকারী – এই বোধ তখন মানবজাতির মধ্য থেকে যেভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে, বিশ্বযুদ্ধপর্বে এসে তা আর বজায় থাকেনি। মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি, চিন্তাশক্তি ও শ্রমশক্তির বলে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা মানবীয় সব কিছুকে মনের মতো করে পুনর্গঠিত করে নিতে পারবে, পৃথিবীকে ঋদ্ধিমান ও সম্প্রীতিময় করে তুলবে – এ বিশ্বাস মানুষের মনে দৃঢ়মূল ছিল। একজনে না পারলে বহুজন মিলে পারবে, এক জেনারেশনে না পারলে জেনারেশনের পর জেনারেশনের চেষ্টায় পারবে – এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল ছিল। সাধারণভাবে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সদর্থক, খারাপের চেয়ে ভালোটাকে মানুষ বড় করে দেখত। পরাজিত মানসিকতা ও নৈরাশ্যবাদ কম লোকের মধ্যে ছিল। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষেরা তখন জাগ্রত ছিল, এবং তাদেরকেও দেখা হত অন্তহীন সম্ভাবনাময় সত্তা রূপে। ভবিষ্যত নিয়ে মানুষের মধ্যে ছিল বাস্তবভিত্তিক, বাস্তবায়নসম্ভব, অন্তহীন স্বপ্ন-কল্পনা। মানুষের সামনে বাস্তব জীবন, বাস্তব সমাজ, বাস্তব রাষ্ট্র ও বাস্তব পৃথিবীর ঊর্ধ্বে ছিল ভবিষ্যতের অভিপ্রেত কল্পিত আদর্শ জীবন, কল্পিত আদর্শ সমাজ, কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র ও কল্পিত আদর্শ পৃথিবী। মহান লক্ষ্যে তখন মানুষ সঙ্ঘশক্তি গড়ে তুলতে পারত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তখন আদর্শ উপলব্ধির ও বাস্তবায়নের জন্য সাধনা ও সংগ্রাম ছিল। এখন সে অবস্থা নেই।

৯

অত্যুন্নত নতুন প্রযুক্তির বিস্তার (১৯৮০-র দশক থেকে) ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের (১৯৯১) পর মানবজাতির জন্য কল্যাণরাষ্ট্রের এবং জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণাকে বিকশিত না করে, সরকার ও রাজনীতিকে দুর্বল করে দিয়ে কথিত সামাজিক ব্যবসা তথা আদর্শ এনজিও ও আদর্শ সিভিল সোসাইটি অরগেনাইজেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কায়েমি স্বার্থবাদীদের দিক থেকে গণতন্ত্রের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্র ধনিক শ্রেণির স্বার্থ হাসিলের অনুকূল রূপ দেওয়া হয়েছে। *গণতন্ত্রকে পর্যবসিত করা হয়েছে নির্বাচনতন্ত্রে, দুর্বল রাষ্ট্রগুলোতে চালানো হচ্ছে নিঃরাজনীতিকরণের কার্যক্রম।* রাজনীতির ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর কঠোর সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে সিএসও (সিভিল সোসাইটি অরগেনাইজেশন) সমূহের দ্বারা। এখন পৃথিবীব্যাপী মানুষ ভুগছে অদ্ভুত এক হীনতাবোধে (inferiority complex)। মানুষের সমাজে নৈতিক শক্তি দুর্বল, সৎসাহস দুর্লভ, সৃষ্টিশীলতা দুর্গত। ব্যতিক্রম আছে। আমি ব্যতিক্রমের কথা বলছি না, সাধারণ অবস্থাটার কথা বলছি। পৃথিবীব্যাপী বিপুল অধিকাংশ মানুষ এখন কেবল বর্তমান নিয়ে ভোগবাদী, স্বপ্নহীন, কল্পনাহীন জীবন

যাপন করছে। আর যে স্বল্পসংখ্যক মানুষ বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছে এবং অত্যুন্নত নতুন প্রযুক্তির সুবিধা নিতে পারছে, তারা নিরঙ্কুশ ভোগবাদী জীবনে মেতে আছে।

মানুষের জীবনে ভোগের বাসনা আছে, তার চরিতার্থতারও দরকার আছে; কিন্তু কেবল ভোগই কি সব?

বিচার-বিবেচনা না করে সবাই দ্রুত যন্ত্রের গতিতে চলছে – চলতে বাধ্য হচ্ছে। পৃথিবীর কোথাও জনগণ কোনো মহান লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ নেই। নেতৃত্ব এখন ভিন্ন চরিত্রের। *সঙ্ঘশক্তি গড়ে তুলে উন্নততর নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থা সৃষ্টির প্রশ্নে – 'মানুষে পারবে'র জায়গায় 'মানুষে পারবে না' – এই হল মানুষ সম্পর্কে আজকের মানুষের ধারণা।* এখন সমাজের অন্তর্গত পশুশক্তি মানুষীশক্তির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে আছে।

তথ্যপ্রযুক্তি ও জীবপ্রযুক্তির বিপ্লব আর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের পর বিশ্বব্যবস্থা বদলে গেছে, পৃথিবী হয়ে পড়েছে দ্বিকেন্দ্রিকের জায়গায় এককেন্দ্রিক, সর্বত্র রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নতুন উদ্যমে নিরঙ্কুশ পুঁজিবাদী রূপ দেওয়া হচ্ছে, পুঁজিবাদের অন্যায়সমূহ অবাধে বেড়ে চলছে, আর মানুষ সামাজিক গুণাবলি হারিয়ে চলছে (dehumanization of man in society)। কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণাও অচল হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলছেন যে, বিশ্বব্যবস্থা বহুকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। তা ঠিক নয়। আদর্শবিহীন প্রতিযোগিতার মধ্যে পৃথিবী এককেন্দ্রিকই থাকবে। নতুন আদর্শ সামনে আনা হলে পৃথিবী আবার দ্বিকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে। সকল রাষ্ট্রেই জুলুম-জবরদস্তি, শোষণ-পীড়ন-প্রতারণা ও হত্যা-আত্মহত্যা দ্রুত বাড়ছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই ধনীদের সঙ্গে গরিবদের, শক্তিশালীদের সঙ্গে দুর্বলদের বৈষম্য, আর ধনী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে দরিদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের বৈষম্য অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে দ্রুততর গতিতে বেড়ে চলছে। অন্যায়-অবিচার বাড়ছে এবং সরকারকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছে। আগ্রাসনের পর আগ্রাসন – যুদ্ধের পর যুদ্ধ লাগানো হচ্ছে। যুদ্ধের প্রভাব পড়ছে সকল রাষ্ট্রের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতিতে। দুনিয়াব্যাপী অনবরত জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। মানবীয় সব কিছুরই সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়ে চলছে। আগে উল্লেখ করেছি, নতুন প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষের খেয়ে-পরে চলার সুযোগ অনেক বেড়েছে এবং বাড়ছে। বৈষয়িক সম্পদও অনেক বেড়েছে এবং বাড়ছে। প্রশ্ন হল, কেবল খাওয়া-পরা ও ভোগ-বিলাস নিয়েই কি মানুষ সন্তুষ্ট থাকবে? কল্পনা (imagination), আদর্শসন্ধিৎসা ও আদর্শনিষ্ঠা থাকবে না? সৃষ্টিশীলতা ও প্রগতিচেতনা থাকবে না? ন্যায়-অন্যায়ের বিবেচনা থাকবে না?

নতুন প্রযুক্তির মালিকানা ও রাষ্ট্রক্ষমতা যাদের হাতে, সেই রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক শক্তি সর্বজনীন কল্যাণে পুরাতন আইন-শৃঙ্খলার জায়গায় উন্নততর নতুন আইন-শৃঙ্খলা গড়ে তুলছে না। সামাজিক নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার নামে তারা কঠোর থেকে কঠোরতর আইন-কানুন ও বলপ্রয়োগমূলক বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন ও কার্যকর করে চলছে – পর্যায়ক্রমে সামাজিক ন্যায় বাড়ানোর কথা একটুও ভাবছে না। সর্বজনীন কল্যাণের দিক থেকে দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থাকে নিকৃষ্টতর রূপ দেওয়া হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির ও জীবপ্রযুক্তির বিপ্লবের এই কালে সময়ের দাবিতেই প্রকৌশল, কারিগরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে পেশামূলক শিক্ষার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। এগুলোর সঙ্গে জাতীয় ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৈতিক বিষয়ে শিক্ষার যথেষ্ট স্থান দেওয়া দরকার ছিল; কিন্তু তা দেওয়া হয়নি। আইনস্টাইনের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য :

> *It is essential that the student acquire an understanding of and a lively feeling for values. He must acquire a valid sense of the beautiful and of the morally good. Otherwise he, with his specialized knowledge, more closely resembles a well-trained dog than a harmoniously developed person.*

১০

বাংলাদেশে ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে র‍্যাব (Rapid Action Battalion) ও তার শাখা-প্রশাখা : চিতা, কোবরা ইত্যাদি। তারপর এদের দ্বারা চালানো হচ্ছে ক্লিনহার্ট অপারেশন, এনকাউন্টার, ক্রসফায়ার ও বন্দুকযুদ্ধের

নামে বিনাবিচারে কথিত সন্ত্রাসী হত্যা। নতুন করে, কার স্বার্থে, কেন এ ব্যবস্থা দরকার হল, এর গতি কোন দিকে – বিবেকবান চিন্তাশীল সকলেরই তা তলিয়ে দেখা কর্তব্য। এর মধ্যে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে জেএমবি। এসবের অবসান ঘটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রচলিত আইন ও বিচারব্যবস্থা দ্বারা সম্ভব হবে না। তার জন্য আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক গোটা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে হবে। সর্বজনীন কল্যাণে আইন-কানুন উন্নত করতে হবে। কেবল দমননীতি দিয়ে অবস্থা স্বাভাবিক করা যাবে না। আইন-কানুন পরিবর্তন করে ন্যায় বাড়াতে হবে, অন্যায় কমাতে হবে।

গণতন্ত্রকে 'উদার গণতন্ত্র' নাম দিয়ে পরিণত করা হয়েছে কায়েমি-স্বার্থবাদীদের হীন স্বার্থ হাসিলের প্রধান উপায়ে। গণতন্ত্র এখন নির্বাচনতন্ত্র – গণতন্ত্র নয়। মধ্যপ্রাচ্যে তেলসমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোতে গণতন্ত্রের নামে যুদ্ধ ও গণহত্যা চালিয়ে জনগণের উপর 'পুতুল সরকার' চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সেখানে দেখা দিয়েছে সহিংসতা – জঙ্গিবাদ। যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের তেল ও অন্যান্য খনিজসম্পদ লুটে নিচ্ছে। অবিচার বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট সহিংসতার নাম দেওয়া হয়েছে 'সন্ত্রাস'। যুক্তরাষ্ট্রের কথিত 'সন্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধে'র, কথিত 'সশস্ত্র ইসলামি মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র, আর কথিত 'গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধে'র সম্ভাবনা ক্রমেই বাড়ছে। যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে সকল রাষ্ট্রের জনসাধারণকে। *কেবল জঙ্গিবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে জঙ্গিবাদ দমন করা যাবে না। শান্তির জন্য মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলো থেকে সকল বিদেশি সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোতে বিদেশি সৈন্য রেখে জঙ্গিবাদ নির্মূল করা অসম্ভব।* কেউ অনুসন্ধান করে দেখতে চান না কেন কীভাবে মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের উদ্ভব ঘটেছে।

মানবজাতি আজ এমন এক অবস্থায় আছে যে, শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মানুষ শতকরা পাঁচভাগ মানুষের হীন-উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় সহিংসতা অনিবার্য। যুক্তরাষ্ট্রের 'ওকুপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট', (২০১১-১২) থেকে বলা হয়েছে, বিশ্বায়নের নামে শতকরা একভাগ লোক বাকি শতকরা নিরানব্বইভাগ লোককে বঞ্চিত করে নিজেদের জন্য সম্পত্তির ক্রমবর্ধমান পাহাড় গড়ে চলছে। তাঁদের মতে, *শোষণ-পীড়ন-প্রতারণা বর্তমান পাশ্চাত্য রাষ্ট্রব্যবস্থার ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশ্বায়নের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। বিশ্বায়নের স্বরূপ যাঁরা তলিয়ে দেখতে চান, তাঁরা এই রকমই অনুভব করেন। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে চলমান বিশ্বায়নে তাঁরা মানবজাতির ভবিষ্যতকে অন্ধকার দেখেন।* তাঁরা বিশ্বব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে উন্নত করার দাবি তোলেন।

১১

পৃথিবীর সর্বত্রই আজকের সভ্যতার-সঙ্কটের উপলব্ধি অগভীর। দুনিয়াব্যাপী কায়েমি-স্বার্থবাদী প্রচারমাধ্যম এমনভাবে প্রচার চালায় যে, সাধারণ মানুষ কায়েমি-স্বার্থবাদী শক্তির প্রতি নির্ভরশীল মানসিকতা নিয়ে চলে। নানা কৌশলে জনমনে ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছে যে, অন্যায়-অবিচার মেনে নিয়েই চলতে হবে। কায়েমি-স্বার্থবাদীদের বাইরে এমন কোনো নেতৃত্বের উত্থান জনগণ আশা করতে পারে না যা সর্বজনীন কল্যাণে কাজ করবে। জনগণ মনোবলহারা। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা জনগণের মনোবল অর্জনের উপযোগী নয়। তবে জনগণের মধ্যে অপরাজেয় সংগ্রামী স্পৃহা দেখা দিতে পারে। এই সঙ্কট গতানুগতিক প্রচেষ্টায় স্বল্প সময়ের মধ্যে কাটিয়ে ওঠা যাবে, এমনটা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। দীর্ঘস্থায়ী সাধনা ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম লাগবে। প্রথমে দরকার নতুন রেনেসাঁসের সূচনা। চলমান মৌলবাদ-বিরোধী, জঙ্গিবাদ-বিরোধী কর্মকাণ্ড দিয়ে কখনো নতুন রেনেসাঁসের সূচনা হবে না; তা সম্ভব হবে গণতন্ত্রের নামে চলমান ভাওতা-প্রতারণা ও দুষ্কর্মের কঠোর সমালোচনা আর শতভাগ মানুষের গণতন্ত্র উদ্ভাবনের ও প্রবর্তনের কার্যক্রম দিয়ে। ভোটাভুটিসর্বস্ব গণতন্ত্র নয়, দরকার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সর্বজনীন গণতন্ত্র।

অত্যুন্নত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এই কালে মানবজাতি বিরাট-বিপুল সম্ভাবনা নিয়েও যে সভ্যতার-সঙ্কটে নিপতিত, তা থেকে উদ্ধার লাভের জন্য উন্নততর নতুন বিশ্বব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জীবনপদ্ধতিতে উত্তীর্ণ হতে হবে। তার জন্য

দরকার ভবিষ্যতমুখী দৃষ্টি নিয়ে রেনেসাঁস, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ন্যায়, প্রগতি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ ইত্যাদি প্রত্যয়ের আমূল পুনর্বিবেচনা, পুনর্গঠন ও নবায়ন। অতীতের উপলব্ধি ও চিন্তা অবলম্বন করে কেবল গতানুগতিতে আবর্তিত হওয়া কিংবা পশ্চাৎগতি সম্ভব, প্রগতি অসম্ভব।

উত্তরাধুনিকতাবাদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকেই grand narrative ও master discourse বলে বিবেচনার বাইরে রাখে, সমগ্রের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেবল অংশের দিকে দৃষ্টি দেয়, আর সমাধানের লক্ষ্য বাদ দিয়ে কেবল সমস্যা বিশ্লেষণ করে। এই মতবাদ যেসব বিষয়কে বিবেচনার বাইরে রাখে, সেগুলোকে বিবেচনার বাইরে রাখা সম্পূর্ণ অনুচিত। সমালোচনা ও অভিজ্ঞতার সারসঙ্কলন দ্বারা অতীতের জ্ঞান ও শিক্ষাকে অবশ্যই আত্মস্থ করতে হবে। আদর্শের ও ক্লাসিকের চর্চা অপরিহার্য। উত্তরাধুনিকতাবাদী যে কোনো বিবেচনার মর্মে থাকে শূন্যবাদ (nihilism) কিংবা নৈরাশ্যবাদ (pessimism)। উত্তরাধুনিকতাবাদীরা কি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা পরিবর্তন করবেন না?

রাষ্ট্রীয় যে কোনো ব্যাপারে কেবল উচ্চশ্রেণির শতকরা পাঁচভাগকেই নয়, মধ্য ও নিম্নশ্রেণির শতকরা পঁচানব্বই ভাগকেও সব সময় যথোচিত গুরুত্বে কার্যকর বিবেচনায় ধরতে হবে। বুঝতে হবে যে, নতুন বাস্তবতায় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বিষয়ক আগেকার ধারণা জনগণের জন্য বিভ্রান্তিকর। নতুন কালের প্রয়োজনে সবকিছুকেই নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। দুনিয়াটাকে বদলানো যাবে, বদলাতে হবে – উন্নত করতে হবে।

১২

নতুন প্রযুক্তির বাস্তবতায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা দুনিয়াব্যাপী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হয়ে, বিশ্বায়নের নামে তাদের সব ধারণা ও কার্যক্রমকে অনবরত পুনর্গঠিত ও বিকশিত করে চলছে। মনে হয়, দুনিয়াব্যাপী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ধারার চিন্তা ও কাজে নতুন জোয়ার দেখা দিয়েছে। সর্বজনীন স্বার্থে কার্যকর প্রগতিশীল চিন্তা ও সঙ্ঘশক্তি পৃথিবীর কোথাও এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অত্যুন্নত নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আমরা রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থার যে পুনর্গঠন ও নবায়ন চাই, তা সর্বজনীন কল্যাণে; যারা শোষিত-বঞ্চিত-নির্জিত, অবশ্যই সেই শতকরা পঁচানব্বই ভাগেরও কল্যাণে। প্রচলিত কোনো চিন্তাধারা ও কর্মধারাকেই আমাদের কাছে ঠিক মনে হয় না। *আমাদের উদ্ভাবন করে নিতে হবে আমাদের কাম্য রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থার রূপ ও প্রকৃতি।* তার জন্য দরকার নতুন সম্ভাবনার উপলব্ধি, সর্বজনীন কল্যাণের সঙ্কল্প, নতুন আশা, নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা, নতুন চিন্তা-ভাবনা, নতুন বৌদ্ধিক জাগরণ ও গণজাগরণ।

দুর্বল জাতিগুলোকে শক্তিশালী জাতিগুলো থেকে উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে, পশ্চিমের দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রগতিশীল মহান সব ভাবধারা আত্মস্থ করতে হবে। এতে দুর্বল জাতিগুলো শক্তিশালী হওয়ার উপায় করতে পারবে। এর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কূটনীতি, গোয়েন্দানীতি, প্রচারনীতি, আধিপত্য ও নির্ভরশীলতা নীতি এবং লগ্নিপুঁজির জালে আটকা পড়লে সর্বনাশ। *আমাদের দরকার এমন জ্ঞান, যা জনজীবনের উন্নতিতে কাজে লাগবে – কর্মের অবলম্বন হবে – যা হবে at once a method of enquiry and a mode of action।* সাম্রাজ্যবাদীদের চাপিয়ে দেওয়া উন্নয়নতত্ত্ব ও উদার গণতন্ত্র নিয়ে দুর্বল জাতিগুলোর স্বাভাবিক উন্নতির ও গণতন্ত্রের সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে – স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনা বিকৃত হচ্ছে। দরকার পরনির্ভর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে অর্থনীতি, রাজনীতি, উন্নয়ন-পরিকল্পনা – সকল বিষয়ে নিজেদের চিন্তা – স্বাধীন চিন্তা।

১৩

যে সভ্যতার সঙ্কটে মানবজাতি আজ নিপতিত, তার প্রকৃতি এবং তা থেকে উদ্ধার লাভের উপায় সম্পর্কে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের বিবেকবান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পরিপূর্ণ মনোযোগ দরকার। চিন্তাশক্তির নিষ্ক্রিয়তা ও পরিবর্তনবিমুখতা দ্বারা দুর্যোগ বাড়ছে। উত্তরণের জন্য প্রথম পর্যায়ে চেষ্টা করতে হবে নতুন রেনেসাঁসের সূচনার জন্য। রেনেসাঁস *কেবল জ্ঞান দিয়ে হবে না, জ্ঞানের সঙ্গে অবশ্যই চরিত্রবল আর কর্মমুখিতা লাগবে।*

নিজ নিজ রাষ্ট্রে শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির প্রসার নিয়ে প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও প্রশাসকেরা চিন্তা করবেন – এটা স্বাভাবিক। তবে তাঁদের চিন্তায় অবশ্যই অর্থনৈতিক বিবেচনার সঙ্গে জাতির আত্মনির্ভরতার ও জনজীবনের সার্বিক কল্যাণের বিবেচনাও অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। প্রযুক্তির প্রসার ও শিল্পায়নের সঙ্গে রাজনৈতিক ও আদর্শগত বিবেচনাও অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে। জনজীবন-ভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি অবলম্বন করে এগোতে হবে। সরকারের ও রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, গতানুগতিক রাজনীতি দিয়ে এসব হবে না।

বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় আদর্শের এবং বাস্তবে রাজনৈতিক দলগুলোর যে অবস্থা, তাতে প্রযুক্তিবিদদের, প্রকৌশলীদের, প্রশাসকদের এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের ভাবুক ও কর্মীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার সুযোগ কতখানি তা বিচার করে দেখতে হবে। সংবিধান এবং সরকার যেভাবে সংবিধানের অনুশীলন করে থাকে তা জাতীয় ঐক্যের অনুকূল নয়। জাতি বিভক্ত হয়ে অনৈক্যের মধ্যে থাকে। সংবিধানে লিপিবদ্ধ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য সামনে নিয়ে উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রণয়ন কি দুঃসাধ্য নয়? ধারণাগুলো তো একমুখী নয়। প্রধান সব রাজনৈতিক দলই সমাজতন্ত্র-বিরোধী। তারা চলছে মুক্তবাজার অর্থনীতি, অবাধ-প্রতিযোগিতাবাদ, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্রের বদলে নির্বাচনতন্ত্র নিয়ে। এসব দল জাতীয় সংসদের নির্বাচন করার সামর্থ্যও রাখে না। জনমনের ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের যে বিভক্ত দশা, সর্বত্র যে অসহিষ্ণুতা ও হিংসা-প্রতিহিংসা, তাতে কীভাবে এসব আদর্শ নিয়ে সার্বিক উন্নতির উপায় করা যাবে? *বাস্তবে অবস্থা এখন এমন যে, সমাজে যার ক্ষতি করার শক্তি যত বেশি, তার প্রভাব-প্রতিপত্তি তত বেশি; কল্যাণ করার শক্তি কোনো শক্তি বলেই স্বীকৃতি পায় না এ সমাজে।*

১৪

বাংলা ভাষার দেশে উনিশ শতকের প্রথম দিকে রামমোহনের চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে যখন বৌদ্ধিক জাগরণের বা রেনেসাঁসের সূচনা হয়, তখন এখানে আধুনিক প্রযুক্তির ও বৃহদায়তন শিল্পের সূচনা হয়নি। তবে রামমোহনের কর্মকালে (১৮১৪-৩৩) বাংলা-বিহার-ওড়িশা ব্রিটিশ শিল্পবলয়ের আওতাধীন ছিল। বাংলার রেনেসাঁসের পেছনে প্রেরণাদায়ক ছিল পশ্চিম ইউরোপের রেনেসাঁস। সেদিন বাঙালি ইউরোপের প্রগতিশীল ভাবধারাকে গ্রহণ করেছিল নিজের সত্তায় – আত্মসত্তাকে সমৃদ্ধ করার জন্য। বাঙালি সত্তা, ভারতীয় সত্তা সে ত্যাগ করেনি।

এ দেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হিন্দুসমাজ ও মুসলমানসমাজ বিকশিত হয়েছে একই শাসনব্যবস্থার মধ্যে থেকে – স্বতন্ত্র ধারায়। দুই সমাজই আলাদা-আলাদাভাবে ধর্মীয় ধারণা ও ধর্মবিশ্বাস সংস্কার করে করে এগিয়েছে। নানা ঐতিহাসিক কারণে ব্রিটিশ-শাসিত বাংলায় হিন্দু সমাজের তুলনায় মুসলমান সমাজে রেনেসাঁস দেখা দেয় প্রায় শতাব্দীকাল পরে। রেনেসাঁসের ধারায় বিশ শতকের শুরুতে দেখা দেয় গণজাগরণ। রেনেসাঁসের মনীষীরা গণআন্দোলনেও সক্রিয় থাকেন।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের (১৯০৫-১১) সময় থেকে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়চেতনা দ্রুত বেড়ে যায়। ওই আন্দোলনের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ রাজনৈতিক রূপ নেয়। ইংরেজ সরকার তার Divide and Rule Policy নিয়ে সক্রিয় থাকে। জাতীয়তাবাদের বদলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ আত্মপ্রকাশ করে। ইতিহাস বিচারে হিন্দু মহাসভার ভূমিকাকে বিবেচনার বাইরে রাখা ঠিক নয়। *রেনেসাঁসের ও গণজাগরণের মধ্যেই সূচিত হয় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা।* আন্দোলনের ফলে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ১৯১১ সালে রদ হলেও ১৯৪৭ সালে কথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় বাংলা আবার ভাগ হয়, এবং পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পাকিস্তানকালে পূর্বপাকিস্তানে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের জায়গায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রবল হয়, এবং তা নিয়ে দীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত কালে আমাদের ইতিহাসে রেনেসাঁসের স্পিরিট ও গণজাগরণ বহমান ছিল। কিন্তু স্বাধীন *বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সার্বিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে এবং এনজিও ও সিভিল সোসাইটি অরগেনাইজেশনের পত্তনের পর বৌদ্ধিক জাগরণ ও গণজাগরণ দুটোই অবসিত হয়।*

১৫

কলকাতায় ও ঢাকায় ১৯২০-এর দশক থেকে শিল্প-সাহিত্যে আধুনিকতাবাদের এবং ১৯৮০-র দশক থেকে শিল্প-সাহিত্যসহ জ্ঞানের সকল শাখায় উত্তরাধুনিকতাবাদের প্রসার ঘটে চলছে। দুটি মতবাদই ফ্রান্স থেকে লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, কলকাতা হয়ে ঢাকায় আসে।

আধুনিকতাবাদের প্রসারকে বিঘ্নিত করে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধ। তবে অচিরেই কলাকৈবল্যবাদ পুনরুজ্জীবিত হয়।

বাংলাদেশের তরুণ লেখক-গবেষকেরা এখন জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতে ভীষণভাবে বৃত্তাবদ্ধ হয়ে আছেন কলাকৈবল্যবাদে ও উত্তরাধুনিকতাবাদে। *কলাকৈবল্যবাদীরা মনে করেন, সাহিত্যে বিষয়বস্তু গৌণ, রচনানীতি বা স্টাইল মুখ্য। শিল্প-সাহিত্যে মূল্যবোধের প্রশ্নকে তাঁরা বিবেচনার বাইরে রাখেন।* গবেষণায় বিষয়বস্তুতে ও মূল্যবোধে গুরুত্ব না দিয়ে methodology-তে গুরুত্ব কেন্দ্রীভূত রাখা হয়। কলাকৈবল্যবাদ ও উত্তরাধুনিকতাবাদ নিয়ে সৃষ্ট সাহিত্যে ও গবেষণায় প্রাণশক্তির পরিচয় অল্পই থাকে।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর যেসব বৌদ্ধিক কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে, সেগুলোতে রেনেসাঁসের ও গণজাগরণের বৈশিষ্ট্য নেই। হুজুগ আছে। হুজুগ আর গণজাগরণ এক নয়। হীন-স্বার্থান্বেষীরা কৃত্রিম উপায়ে জনসাধারণকে আন্দোলনে মাতিয়ে তাদের স্বার্থ হাসিল করে নেয়। গণজাগরণে জনগণের অন্তর্গত মহৎ মানবীয় গুণাবলির প্রকাশ ঘটে।

বাংলাদেশে সভ্যতার নিজস্ব সঙ্কট আছে; তার উপর কাজ করছে বৈশ্বিক সঙ্কট। কথিত উন্নয়ন-সহযোগীরা (development partners) ও কথিত দাতাসংস্থাগুলো (doner agencies) বাংলাদেশকে সঙ্কট অতিক্রম করে প্রগতিশীল অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে দিচ্ছে না। প্রযুক্তি গ্রহণে ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বাধীনতা রক্ষা করে চলছে না। এনজিও ও সিভিল সোসাইটি অরগেনাইজেশনসমূহের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের গড়ে ওঠার প্রতিকূল। সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য পর্যায়ক্রমে তাকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কোনো বিকল্প নেই। যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীদের নেতৃত্বে চলমান বিশ্বায়নে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হবে না। বাংলাদেশ যদি পরনির্ভরতা ও হীনতাবোধ ত্যাগ করে, এবং তার জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সত্তা, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে স্বাধীনভাবে উন্নতির উপায় খোঁজে, মানবজাতির মহান ঐতিহ্য ও সৃষ্টিধারা থেকে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পদ গ্রহণ করে নিজের আত্মশক্তি বৃদ্ধি করে, তাহলে সে হয়ে উঠবে স্বাধীন, শক্তিশালী, সমৃদ্ধসুন্দর, সৃষ্টিশীল ও প্রগতিশীল।

যে সভ্যতার সঙ্কটে মানবজাতি নিপতিত, তা সৃষ্টি হয়েছে সভ্যতার উপর নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভিঘাতের মধ্যে কার্যকর উন্নত নৈতিক চেতনার বিকাশ না ঘটার, সভ্যতার ধারাকে অবারিত রাখার মতো নেতৃত্ব সৃষ্টি না করার এবং বিশ্বব্যবস্থায় উপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কারণে। সমস্যার সূচনা শিল্পবিপ্লব সূচিত হওয়ার পরেই। স্টিম ইনজিন ও অটোমোবাইলস, বিদ্যুৎ, আণবিক শক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি ও জীবপ্রযুক্তি ইত্যাদির আবিষ্কার ও ব্যবহার পর্যায়ক্রমে জনজীবনে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাধন করেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সুবিধা অনেক হয়েছে, তবে সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে : অন্যায়-অবিচার

বেড়েছে। দুই বিশ্বযুদ্ধের কালে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের পর সমস্যা ব্যাপক ও গভীর রূপ ধারণ করেছে। কারণ-করণীয়-করণ ও ফলাফলের সূত্র ধরে ঘটনাপ্রবাহকে গভীরভাবে বুঝতে হবে। তারপর উন্নততর নতুন জীবন, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ধাপে ধাপে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

১৬

এখন মানবজাতির সামনে কোনো আদর্শ নেই – মহান কোনো লক্ষ্য নেই। জনগণের জন্য অতীতের সব আদর্শ সেকেলে ও অকেজো হয়ে পড়েছে। কোনো জাতিও মহান কোনো লক্ষ্য অবলম্বন করে চলছে না। কায়েমি-স্বার্থবাদীদের কর্তৃত্ব সর্বত্র। নতুন প্রযুক্তির অভিঘাতের মধ্যে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণাকে পুনর্গঠিত করা হয়নি। এর মধ্যে কায়েমি-স্বার্থবাদীরা নিজেদের হীন স্বার্থে সব আদর্শকে বিকৃত করে গণবিরোধী রূপ দিয়েছে। *যে বিশ্বায়নের কথা সর্বত্র সব সময় বলা হয়, তা সাম্রাজ্যবাদেরই উচ্চতর রূপ মাত্র।* উন্নততর নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টির জন্য সবকিছুরই আমূল পুনর্বিবেচনা ও নবায়ন দরকার। সমন্বয়বাদী (thesis-antithesis-synthesis) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, দূরদর্শী বিচার-বিবেচনা অবলম্বন করে, সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে নতুন অভিযাত্রা দরকার।

অত্যুন্নত নতুন প্রযুক্তির এই কালে *জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ* বিষয়ক চিন্তা-ভাবনাকে নবায়িত ও বিকশিত করতে হবে। জাতীয়তাবাদের মর্মে স্থান দিতে হবে 'শতভাগ মানুষের গণতন্ত্র' বা 'সর্বজনীন গণতন্ত্র'কে। এই গণতন্ত্রকে আমরা নাম দিই 'নয়াগণতন্ত্র'। এর রূপ ও প্রকৃতি আমাদের উদ্ভাবন করে নিতে হবে। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে রাষ্ট্রগঠনের আদর্শ ও কর্মসূচি না থাকলে জাতীয়তাবাদ অল্পতেই অচল হয়ে পড়ে। *জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ অবলম্বন করে গড়ে তুলতে হবে আন্তর্জাতিক ফেডারেল বিশ্বসরকার। বিশ্বসরকারের রূপ ও প্রকৃতিও আমাদের উদ্ভাবন করে নিতে হবে। জাতিরাষ্ট্র ও জাতীয় সরকার বিলুপ্ত হবে না, বিশ্বসরকার হবে জাতীয় সরকার সমূহের ঊর্ধ্বতন এক কেন্দ্রীয় সরকার। বিশ্বসরকারের কাছে একটি সেনাবাহিনী রেখে সকল রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করা যাবে। প্রস্তাবিত নতুন বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে জাতিরাষ্ট্র, জাতি, জাতীয় ভাষা ও জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশমান থাকবে। জাতীয় সরকারের অল্প কিছু ক্ষমতা চলে যাবে বিশ্বসরকারের কাছে।* বিশ্বসরকার জাতিরাষ্ট্র সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির, বিরোধ মীমাংসার ও প্রগতির লক্ষ্যে কাজ করবে। নতুন বিশ্বব্যবস্থায় যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত হবে। জাতিসঙ্ঘকে বিশ্বসরকারে পরিণত করা যেতে পারে। প্রয়োজনে স্বতন্ত্র বিশ্বসরকার গঠনের লক্ষ্যও নির্ধারণ করা যেতে পারে।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনোটাই হবে না, সাধনা ও সংগ্রাম লাগবে। যে বিশ্বব্যবস্থার কথা আমরা ভাবছি, তার দিকেই মানবজাতিকে এগোতে হবে। এ উদ্দেশ্যে অবিলম্বে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধিক আন্দোলন (intellectual movement) গড়ে তুলতে হবে। হীনতাবোধ কাটিয়ে, হতাশা কাটিয়ে, গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে চললে বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে অবশ্যই লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে। এটা নির্ভর করে আমাদেরই সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি, চিন্তাশক্তি ও শ্রমশক্তির উপর।

জাতীয়তাবাদের মর্মে রাষ্ট্রগঠনের আদর্শ, কর্মসূচি ও কার্যক্রম না থাকলে কিছু দূর এগিয়ে জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি হল রাষ্ট্রগঠনের আদর্শ। শুধু কথা দিয়ে হয় না, আদর্শের রূপ ও প্রকৃতি লিখিতরূপে স্থির করে নিতে হয়। আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হয় প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি করে এবং পর্যায়ক্রমিক দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচি অবলম্বন করে। *নেতৃত্ব গঠিত হয় রাজনৈতিক দল দিয়ে।* আদর্শের রূপ ও প্রকৃতি গণবিরোধী হলে তা সভ্যতা-সংস্কৃতি-প্রগতির পরিপন্থী হয়। সর্বজনীন কল্যাণের আদর্শ, কর্মসূচি ও কর্মনীতি কার্যকর থাকলেই সভ্যতা-সংস্কৃতি-প্রগতি চলমান থাকে। আদর্শের বাস্তবায়ন দলের ভেতর থেকে আরম্ভ করতে হয়।

সকলের, বিশেষ করে সমাজের নিচের স্তরের পঁচানব্বই শতাংশ মানুষের মুক্তি ও উন্নতি কথিত উদার গণতন্ত্র দিয়ে হবে না। ফরাসি বিপ্লব থেকে আজ পর্যন্ত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শগত

ও বাস্তবায়নগত অভিজ্ঞতার সারসঙ্কলন করে এবং সভ্যতার বিকাশে ধর্মের ভূমিকা সদর্থক দৃষ্টিতে বিচার করে ভবিষ্যতদৃষ্টি নিয়ে *গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ের (synthesis) মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে সর্বজনীন গণতন্ত্রের আদর্শ। এতে সর্বাঙ্গীণ জাতীয় উন্নতির কর্মসূচি অপরিহার্য রূপে যুক্ত থাকবে রাজনীতিতে। জাতীয় উন্নতির কর্মসূচির মধ্যে শতভাগ মানুষের উন্নতির কর্মসূচি থাকবে। কর্মসূচি হবে মেয়াদি। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নতুন মেয়াদের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। রাজনীতির কাজ হবে জনজীবনের সমস্যা সমাধান, উন্নয়ন এবং পর্যায়ক্রমে অন্যায় কমানো ও ন্যায় বাড়ানো। সরকার গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। প্রত্যেক রাষ্ট্রে সরকার গঠনের জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ধারণাকে, পুনর্গঠিত ও নবায়িত করে, সর্বজনীন গণতন্ত্রে গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দিতে হবে জনগণের (of the people, by the people, for the people) রাজনৈতিক দল গঠনে।* বিবেকবান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে সর্বজনীন গণতন্ত্রের ও নতুন বিশ্বব্যবস্থার রূপ ও প্রকৃতি স্থির করতে হবে। 'সর্বজনীন গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র' ও তার সম্পূরক 'আন্তর্জাতিক ফেডারেল বিশ্বসরকার' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নততর নতুন বিশ্বব্যবস্থা ও নতুন মানবজাতি গড়ে তুলতে হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের পর অত্যুন্নত প্রযুক্তির পরিবেশে অভীষ্ট নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই হতে পারে মানবজাতির সামনে লক্ষ্য। এর জন্য আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ও বৈশ্বিক সকল কর্মকাণ্ডের মর্মস্থলে চাই জাগ্রত নৈতিক চেতনা ও নৈতিক বিবেচনা। চিন্তা ও কাজকে একই প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য দুই অংশ রূপে গণ্য করতে হবে। দুয়ের যে কোনো একটিকে বাদ দিলে প্রক্রিয়া খণ্ডিত ও ব্যর্থ হয়ে যায়।

বাংলাদেশে জনগণের পক্ষ থেকে গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী বলে আত্মপরিচয়দানকারীরা যদি এই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে অগ্রসর না হন, রাজনৈতিক সততার পরিচয় না দেন, উদ্দেশ্যনির্ণয়ে ও উদ্দেশ্যনিষ্ঠায় দুর্বলতার পরিচয় দেন, প্রয়োজনীয় নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সফল না হন, তাহলে অচিরেই একটি সুদীর্ঘ ঐতিহাসিককালের জন্য পুনরুজ্জীবিত ধর্মীয় শক্তির রাষ্ট্রক্ষমতা দখল অনিবার্য হবে। গণতন্ত্রের নামে অনাচার, জুলুম – জবরদস্তি ও দুর্নীতি দেখে সাধারণ মানুষ অসহায় বোধ করছে এবং ধর্মের দিকে ঝুঁকছে। আমরা বাংলাদেশে গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের ব্যর্থতা দেখতে চাই না – সাফল্য দেখতে চাই। আমরা আমাদের জাতির জীবনে এবং গোটা মানবজাতির মধ্যে প্রস্তাবিত নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থার লক্ষ্য নিয়ে মহান নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশ ও মহান সব সম্ভাবনার বাস্তবায়ন চাই।

ঢাকা, নভেম্বর ২০১৪

গ্রন্থপঞ্জি

Oswald Spengler, *The Decline of the West*, 2 vols (Eng. trans), New York, 1926, 1928

Albert Schweitzer, *The Decay and Restoration of Civilization* (Eng. trans), London, 1923

.... Civilization and Ethics (Eng. trans), London, 1923

Arnold Toyenbee, *The World and the West*, London, 1912

......, *A Study of History* (abridgement of volumes I-IV by D. C. Somervell), New York, 1946

H. G. Wells, *A Short History of the World*, Penguin Books, 1946

Aninindita N. Balslev edited, *On World Religions*, New Delhi, 2014

V. Gordon Childe, *What Happened in History*, London 1963

...... *Man Makes Himself*, Pengin Books, 1951

Albert Einstein, Ideas and Opinions, Rupa and Co. New Delhi, 2008

Fernanad Braul, *A History of Civilizations*, Penguin Books, 1993

R. Palme Dutt, *Problems of Contemporary History*, London, 1963

Herbert Marcuse, *One Dimentional Man*, G.B. 1964

Albert Bergesen edited, *Crises in the World-System*, London, 1983

Errol E. Harris & James A. Yunker edited, *Toward Genuine Global Governance*, London, 1999

Our Golbal Neighbourhood : the Report of the Commission on Global Governance, Oxford Universtiy Press, 1995

Willis Harman, *Global Mind Change : The New Age Revolution in the Way We Think*; New York, 1988

Han Nianlong, *Diplomacy of Contemporary China*, Hong Kong, 1990

Robert Cox, *Approaches to World Order*, New York, 1996

Meghnad Desai & Paul Redfern edited, *Global Governance : Ethics and Economics of the World Order*, New York, 1995

J. G. De Beus, *The Future of the West*, London, 1953

Bertrand Russel, *Has Man a Future*, London, 1961

..... *Human Society in Ethics and Politics*, London, 1958

..... *Power : A New Social Analysis*, New York, 1938

.... *History of Western Philosophy*, London, 1980

Erich Fromm, *The Sane Society*, New York, 1955

.... *The Fear of Freedom*, G. B 1942

.... *To be or To Have*, G.B., 1940

Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, first published in the USA, in Great Britain and the Peuguin Books. 1992

Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, first published in the USA : 1996, published in Penguin Books, 1997

Ernest Barker, *National Character*, London, 1948

J. B. Bury, *The Idea of Progress*, New York, 1960

Muhammad Yunus, *Building Social Business : the New Kind of Capitalism that Serves Humanity's Most Pressing Needs*, USA, 2010

..... *Creating a World without Poverty : Social Business and the Future of Capitalism*, New York, 2007

Eric Hobswn, *How to Change the World : Reflections on Marx and Marxism*, Yale University Press, 2011

John, M. Hunn, *Contemporary Crisis of the Nation-State*, Washington DC, 1994

Joseph E. Stiglitj, *Globalization and Its Discontents*, New York, 2002

Nicholas Hagger, The *World Government : A Blueprint for a Universal World State*, UK, 2010

Uoity Yang, *A Global State through Democratic Federal World Government*, UK, 2011

Samir Amin, *The World We Wish to See*, New York, 2009

Willium Morris, How *We Live and How We Might Live*, Kolkata, 2012

Saval Sarkar, *Eco-Socialism or Eco-Capitalism*, London, 1999

Barbara Parkar, *Introduction to Globalization and Business*, New Delhi, 2005

Gown Baylis, Steve Smith, Patricia Owners, *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, UK, 2008

Hans Lofgren & Prakash Sarangi edited, The *Politics and Culture of Globalization*, Delhi, 2009

Zygmust Beumah, *Postmodern Ethices*, Blackwell, Oxford, UK, Cambridge, USA, 1996

Edward Said, *Orientalism*, Vintage Books, London, 1990

.... *Culture and Imperialism*, Vintage Books, London, 1994

সমির আমিন ও ফ্রাঁসোয়া উতার সম্পা., *প্রতিরোধের বিশ্বময়তা*, কলকাতা ২০০৪

শোভনলাল দাশগুপ্ত, *সমাজ-মার্কসতত্ত্ব ও সমকাল*, কলকাতা, ২০০৯

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, *দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস* (দুই খণ্ড), কলকাতা, ১৯৮৬

কাভালজিৎ সিং (মনোয়ার মোস্তফা ও এম এম আকাশ অনূদিত), *বিশ্বায়ন : কিছু অমীমাংসিত প্রশ্ন*, ঢাকা, ২০০৫

অমিয়কুমার বাগচি সম্পা., *বিশ্বায়ন : ভাবনা দুর্ভাবনা* (দুই খণ্ড) কলকাতা, ২০০২

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিকল্প বিশ্বায়ন*, কলকাতা, ২০০৪

শামসুজ্জোহা মানিক, *মার্কসবাদের সঙ্কট ও বিপ্লবের ভবিষ্যত*, ঢাকা, ২০১০

আনু মাহমুদ, *বাংলাদেশে এনজিও*, ঢাকা, ২০১১

আনু মুহাম্মদ, *বিশ্বায়নের বৈপরীত্য*, ঢাকা, ২০০৩

রতনতনু ঘোষ সম্পাদিত, *বহুমাত্রিক বিশ্বায়ন*, ঢাকা ২০০৯

আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বিশ্বায়ন ও সভ্যতার ভবিষ্যত*, ঢাকা, ২০১২

.... *জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদ বিশ্বায়ন ও ভবিষ্যত*, ঢাকা, ২০১৪

.... *গণতন্ত্র ও নয়াগণতন্ত্র*, ২০১২

.... *প্রাচুর্যে রিক্ততা*, ঢাকা, ২০১০

আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সম্পা. *মানুষের স্বরূপ*, ঢাকা, ২০০৭

শ্যামলী গুপ্ত, মালিনী ভট্টাচার্য ও ইশিতা মুখোপাধ্যায় সম্পা., *নারী ও বিশ্বায়ন*, কলকাতা, ২০০৭

মাসুদুজ্জামান ও ফেরদৌস হোসেন সম্পা., *বিশ্বায়ন : সঙ্কট ও সম্ভাবনা*, ঢাকা, ২০০৪

বদরুদ্দীন উমর, *সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের মুখে সমাজতন্ত্রের পদধ্বনি*, ঢাকা, ২০১২

.... *এনজিও : দরিদ্রতা : উন্নয়ন*, ঢাকা, ২০১৪

ফকরুল চৌধুরী সম্পা., *সিভিল সোসাইটি*, ঢাকা, ২০০৮

.... সম্পা., *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ*, ঢাকা, ২০১১

অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, *উত্তর-আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক*, কলকাতা, ২০১১